রানি কাটিয়ানার ডান হাত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাজ্য জুড়ে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। কিন্তু রাজার সন্ধান নেই। রাজসভায় এসে বসছেন রানি কাটিয়ানা।

রানির বয়েস মাত্র উনিশ। কিছুদিন আগেই তিনি ছিলেন রাজকুমারী, ছিলেন এক চঞ্চলা তরুণী, সখীদের সঙ্গে নাচ-গানে মেতে থাকতেন সর্বক্ষণ। এখন তাঁকে দেখলে তা বোঝাই যায় না। এখন তিনি ধীর, স্থির, শান্ত, প্রায় সারা দিনই রাজ্য পরিচালনার নানান কাজ ও পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রাজার সব দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এই অল্পবয়েসি রানিকে।

রাজা কোথায়? কেউ জানে না।

সীমান্তে হানা দিয়েছে শত্রুবাহিনী, তাদের শক্তি যে কতখানি তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকদিন ধরে তারা সেখানে থমকে আছে।

কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, প্রাচ্যের এক রাজা নাকি মহা শক্তিশালী হয়ে হানা দিয়েছে ইওরোপে, জয় করে নিচ্ছে একটার পর একটা রাজ্য। এই সংবাদ প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এক সময়ে ইওরোপীয় রাজ্যগুলিই তো জাহাজ ভাসিয়ে সেনা পাঠিয়েছে প্রাচ্যে। প্রাচ্যের ভারত যেন রূপকথার দেশ, সেখানে আছে অফুরন্ত সোনাদানা, রেশম বস্ত্র, নানা রকম সুস্বাদু মশলাপাতি, প্রায় বিনা যুদ্ধেই সেখানে লুঠতরাজ করা যায়। ভারত নাকি কখনও বিদেশে জয়ের জন্য সৈন্য পাঠায়নি। ওরা শুধু নিজেদের দরজা খোলা রাখে।

এবারে ইওরোপের দিকে ধেয়ে আসছে কারা ?

গুপ্তচর এসে খবর দিয়েছে, রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচ্যের এই সেনাবাহিনী নাকি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, এরা নারী শিশুদের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। গুজব বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যেন প্রাচ্যের প্রতিটি সৈনিকই নরদানব।

সীমান্ত এলাকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসছে রাজধানীর দিকে।

জর্জিয়া একটি ছোট রাজ্য। কিন্তু সাহসী যোদ্ধার অভাব নেই, দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তবে শুধু প্রাণ দিলেই তো আর স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। শত্রু পক্ষের শক্তি-সামর্থ্য না বুঝে যুদ্ধের সঠিক প্রস্তুতিও নেওয়া যায় না।

রানি কাটিয়ানা ঠিক করলেন, দশজনের একটি দলকে পাঠানো হবে সীমান্তে। তারা ছদ্মবেশে হোক আর যে করেই হোক, বিরুদ্ধ পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সব সুলুক সন্ধান নিয়ে আসবে। এ জন্য অসম সাহসী পুরুষদের দরকার।

সে রকম নির্বাচন করা হয়েছে দশজনকে। তাদের নেতার নাম জোসেফ।

সকালবেলা মন্ত্রণাসভায় গুপ্তকক্ষে রানির আশীর্বাদ নিতে এসেছে সেই দশজন মরণ-পণ করা সৈনিক।

সিংহাসনে বসে আছেন রানি কাটিয়ানা, তাঁর বয়স এই সব সৈনিকদের চেয়েও কম। কিন্তু রানির মর্যাদায় তিনি আশীর্বাদ দেওয়ার অধিকারিনী। রাজা অনুপস্থিত বলেই এই অধিকার রানির ওপর বেশি করে বর্তেছে।

প্রথমে বাইবেল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল সকলে। তারপর রানি কাটিয়ানা পবিত্র জর্ডন নদীর জল ছেটানো একটি তলোয়ার তুলে দিতে গেলেন জোসেফের হাতে। তলোয়ারটা যে অত ভারী তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল।

তিনি নিচু হয়ে তলোয়ারটা তুলতে গেলেন, জোসেফও একই সঙ্গে হাত বাড়ালো। দুজনের হাত ছোঁয়াছুঁ÷য়ি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গে কেঁপে উঠল জোসেফের সর্বাঙ্গ।

সাধারণ মানুষ কখনও রানির অঙ্গ স্পর্শ করে না। কিন্তু এ তো ইচ্ছকৃত নয়। এমনই ঘটে গেছে। কেউ কিছু মনে করল না। যথারীতি অস্ত্র দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সদলে বেরিয়ে গেল জোসেফ।

ঘোড়ার পিঠে চেপেও বেশ কিছুক্ষণ যেন ঘোরের মধ্যে রইল জোসেফ।

রানির ছোঁয়ায় তার সর্বাঙ্গে এমন শিহরণ হল কেন ? রানি বলেই তো তাঁর অলৌকিকত্ব কিছু নেই। তবে তিনি

অসাধারণ রূপসী। তাঁর রূপের যেন একটা দিব্য প্রভা আছে। এ সেই রূপের স্পর্শ।

জোসেফের দলটি সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতেই পারল না। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল আক্রমণকারীরা। সে এক বিশাল বাহিনী, অগণন, তাদের মধ্যে হাজার হাজার অশ্বারোহী, উটের পিঠেও সৈন্য, এদিককার মানুষ আগে উটই দেখিনি। এরা পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাস-এর সেনা।

সেই আক্রমণের মুখে জর্জিয়ার যোদ্ধারা খড়কুটোর মতন ভেসে গেল। জোসেফের সঙ্গীরা কেউ রক্ষা পেল না, শুধু জোসেফ এক খড়ের গাদায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জ্ঞান হওয়ার পর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জোসেফ দেখল, তার শরীরে তেমন কিছু আঘাত লাগেনি, সব অঙ্গই অক্ষত। ঘোড়া থেকে সে ছিটকে পড়েছিল।

জোসেফ তার চোখের সামনে অন্য কয়েকজন সঙ্গীকে নিহত হতে দেখেছে। তবু সে বেঁচে গেল কী করে?

জোসেফের মনে হল, রানি কাটিয়ানার স্পর্শই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যুক্তি থাক বা না-ই থাক, এই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়ে গেল তার।

রানি কাটিয়ানা নিজে অবশ্য রক্ষা পেলেন না।

পারস্যের সেনাবাহিনী রাজধানী তছনছ ও লুঠতরাজ করেই শান্ত হল না, তারা বন্দী করে নিয়ে গেল রানি কাটিয়ানাকে।

তাঁকে রাখা হল সিরাজ শহরে।

সাধারণ কারাগারে নয়, তাঁকে রাখা হল একটি উদ্যান গৃহে। প্রহরী রইল অবশ্যই। কিন্তু তাঁকে খানিকটা রানির মর্যাদাও দেওয়া হল।

শাহ আব্বাস একের পর এক দেশে বিজয় অভিযানে মত্ত হয়ে রইলেন, ভুলেই গেলেন এই বিশেষ বন্দিনীর কথা। ওদিকে জর্জিয়ায় তখন সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা, কেউ আর খোঁজও করে না রানির। রাজা আগে থেকেই একটা কঠিন রোগে ভুগছিলেন, সে কথা গোপন রাখা হয়েছিল প্রজাদের কাছে। সেই অসুস্থ অবস্থায় তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

একমাত্র জোসেফ ভোলেনি রানিকে।

সে জর্জিয়া ছেড়ে ভ্রাম্যমান রইল কয়েক বছর। সে বিবাহ করেনি। রানি কাটিয়ানার সেই স্পর্শের সুখস্মৃতি তার মনে এমনই হয়ে আছে যে কোনও নারীকে স্পর্শ করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর মধ্যে সে গির্জায় যোগ দিয়ে পুরোপুরি পাদ্রী হয়েছে। আরও কয়েকজন পাদ্রীর সঙ্গে সে এক সময় এসে পৌঃছেছে সিরাজ শহরে।

এর মধ্যে কেটে গেছে দশ বছর।

জোসেফের নেতৃত্বে পাদ্রীরা রানিকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করলেও সেটা খুব দেরি হয়ে গেছে।

এতদিন রানির বাহির পাহারা খানিকটা ঢিলেঢালা থাকলেও হঠাৎ অনেক প্রহরী এসে ঘিরে রাখল সেই বাড়ি। তা অবশ্য জোসেফদের কারণে নয়।

দশ বছর পর পারস্য সম্রাট রাজধানীতে কিছুক্ষণের জন্য থিতু হয়ে বসেছেন, এমন সময় কেউ তাঁর কানে তুলল রানি কাটিয়ানার কথা। দশ বছরেও রানি কাটিয়ানার রূপ একটুও কমেনি। বরং রূপের বিভা আরও বেড়েছে। অনেক পরিণত হয়েছে শরীর।

শাহ আব্বাস এই বন্দিনীর রূপের বর্ণনা শুনে বললেন, তা হলে ওকে একলা এক জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে কেন? ওকে আমার হারেমে নিয়ে এসো। তার আগে অবশ্যই ওকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবে, আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি আছি।

একজন অমাত্য গিয়ে রানিকে জানালো, তোমার সুসময় এসেছে, বন্দিনী। মহামান্য সম্রাট তোমাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন। কালক্রমে তুমিই হয়তো পাটরানি হবে।

রানি কাটিয়ানা বললেন, আমরা ক্রিশ্চান। আমার স্বামী সম্ভবত এখনও বেঁচে আছেন। আমাদের তো দ্বিতীয় বিবাহ হয় না।

তা শুনে অমাত্য আর তার সঙ্গীরা হেসেই বাঁচে না।

লুণ্ঠিত মেয়েদের আমার জাত-ধর্ম কী? মহামান্য বাদশাহ যে এই দাসিটিকে শুধু রক্ষিতা করে না রেখে বিয়ে করতেও রাজি হয়েছেন, সেটাও তো ওর বড় ভাগ্য!

অমাত্য বলল, ঠিক আছে, ধর্ম নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি মুসলমান হবে। তখন আর তোমার দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা থাকবে না।

কাটিয়ানা বললেন, আমি যদি আমার ধর্ম ছাড়তে রাজি না হই?

অমাত্য বলল, সে প্রশ্নই ওঠে না। তুমি রাজি-অরাজি হবার কে? তোমাকে জোর করা হবে।

রানি দেখলেন, যদি একটা কথাও উচ্চারণ না করি?

অমাত্য বললেন, তা হলে তোমার ওপর জোর করা হবে। এতদিন যা হয়নি, মারধর খেলেই তুমি বাপ বাপ বলবে।

অমাত্যের এক সঙ্গী নরম গলায় বলল, রানি, মানুষের জীবনের থেকেও কি ধর্ম বড়? আপনি যদি ধর্ম বদল করতে

রাজি না থাকেন, তা হলে এরা আপনাকে মেরেই ফেলবে বোধহয়।

রানি কাটিয়ানা শান্ত ভাবে বললেন, সব কিছুর চেয়েই জীবন বড়। ধর্ম বদল করেও বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু কেউ যদি জোর-জবরদস্তি কিংবা অত্যাচারের ভয়ে ধর্ম বদল করে, তা হলে মানুষের আত্মমর্যাদা থাকে কোথায় ? আত্মমর্যাদা খুইয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুরও অধম।

সেই তখন থেকে রানি কাটিয়ানা একেবারে মুখ বন্ধ করলেন। শত অত্যাচারেও তাঁকে দিয়ে আর একটি কথাও বলানো গেল না।

রানি কাটিয়ানা নিজের ইচ্ছাশক্তিতে মৃত্যুবরণ করলেন।

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে তাঁর শরীর পুঁতে দেওয়া হল বিধর্মীদের কবরখানায়।

জীবিত অবস্থায় জোসেফ আর রানির দেখা পেলেন না বটে, কিন্তু এক রাতে চুপি চুপি সঙ্গীদের নিয়ে এসে মাটি খুঁড়ে রানির হাড়গোড় তুলে নিয়ে গেলেন।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে, তাই কয়েকজন মিলে সেই কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ ভাগ ভাগ করে রাখলেন নিজেদের কাছে। জোসেফের কাছে রইল রানির ডান হাত আর করতল।

অমূল্য সম্পদের মতন সেই হাড় নিয়ে জোসেফ পালিয়ে এলেন ভারতে। তখন পর্তুগিজরা ভারতের কয়েকটি দ্বীপ দখল করে রাজত্ব শুরু করেছে। গোয়ায় তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন গির্জা।

জোসেফ একটি গির্জায় আশ্রয় নিয়ে সসম্মানে কবর দিলেন রানি ডান হাত ও করতল।

তারপর কেটে গেল কয়েকশো বছর। এর মধ্যে রোমের পোপ রানি কাটিয়ানার আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে সেন্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

জোসেফ যে গির্জায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ছিল অগাস্টানিয়ান পাদ্রীদের অধীনে। খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেক রকম দলাদলি আছে। সে যুগে আরও বেশি ছিল। পর্তুগালে অগাস্টানিয়ানদের সঙ্গে অন্য শাখার তীব্র বিবাদ বাধে। তার প্রতিক্রিয়ায় গোয়া সরকার অবিলম্বে সব অগাস্টানিয়ানদের গোয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেয়।

শুধু তাই নয়, সেই চ্যাপেলটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এতদিন বাদে, ইউনেস্কো সেই চ্যাপেলকে হেরিটেজ বিল্ডিং বলে ঘোষণা করেছে, ধ্বংসস্তূপে খননকার্য চলছে পুরোদমে।

বর্তমান জর্জিয়া সরকারের একটি দল এসেছিল গোয়ায়, তাদের রানি কাটিয়ানার দেহাবশেষ নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু রানি কাটিয়ানার ডান হাত ও করতল বহু খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি সেই ধ্বংসস্তূপে। তা কীভাবে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

** এই কাহিনির অর্ধেক ইতিহাস, বাকি অর্ধেক কল্পনা।

....